সলিল চৌধুরীর গান : এক অনন্য মুর্ছনা

নীলাঞ্জন কুমার

চল্লিশ দশকের প্রথম দিক থেকে আমরা যদি বাংলা গান নিয়ে একটু ভাবতে চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে এক বিশেষ বিবর্তনের চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী যে সব গীতিকার সুরকার এসেছেন তাঁদের যে ধারা চলছিল এর পরের অনেকে বাংলা গানে তাকেই অনুসরণ করে চলার পক্ষপাতি ছিলেন। কার্যত ১৯৪০ সালে কলকাতায় বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত গণনাট্য সংঘের জন্মলগ্নের পর থেকে বাংলা গানের নতুন এক ধারা সূচিত হয় আর ক্রমে ক্রমে তা রাজনৈতিক সমর্থন পেয়ে বিকশিত হতে থাকে। পাশাপাশি এ সব গানকে তৎকালীন রেকর্ড কোম্পানী, রেডিও গুরুত্ব না দেওয়ায় তা ব্যবসায়িক দিক থেকে অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, দেখতে হবে যে, সে সময় গণনাট্য সংঘের ভেতর দুই ধরনের শিল্পী সাহিত্যিক এসে জড়ো হন। তাঁদের বেশীরভাগ অংশই রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফরমায়েশ মতো শিল্প সৃষ্টি করতে লাগলেন। অন্যদিকে ছিলেন শম্ভু মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী প্রমুখ।

সলিল চৌধুরীর সংগীত জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ গণনাট্য সংঘের মাধ্যমেই গণসংগীত রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে। ১৯৪০ সালে তৎকালীন বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখানোর পরে তিনি ১৯৪০ সাল থেকে যে গণসংগীত সৃষ্টি শুরু করলেন তা কিন্তু স্রেফ পার্টি সংগীত না হওয়ার কারণে শুরু হল তাঁর ওপর পার্টির সমালোচনা। সলিল চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে জানিয়েছেন ঃ 'বহু জায়গাতেই পার্টি লাইনের সঙ্গে আমার বিরোধিতা ছিল। তবে দাঙ্গা বিরোধী গান আমি লিখেছি। কিন্তু দ্বিজাতি - তত্ত্বের প্রভাবে কোন গান লিখিনি।' একথা অনস্বীকার্য যে কার্যত সে সময় ললিল চৌধুরী বাদ দিয়ে যাঁরা গণসংগীত লিখেছেন তাঁরা সামগ্রিকভাবে সংগীতের দিক থেকে উত্তীর্ণ হতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে সলিল চৌধুরী জনচিত্তে বিশেষ স্থান নিতে পারছিলেন। 'ও মোদের দেশবাসীরে-আয়রে পরাণ রাম ভাই আয়রে রহিম ভাই, কালো নদীতে হবি পার' কিংবা 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা', 'পথে এবার নামো সাথী'-র মতো গান যখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরছে তখন তিনি সংঘের একাংশের কাছে দলদাস না হওয়ার অপরাধে ধিকৃত হচ্ছেন। চল্লিশের শেষপাতে যখন গণসংগীত ছাড়াও অন্যান্য গানের দিকে তিনি ধীরে ধীরে নজর দিচ্ছেন সে সময় ১৯৪৯ সালে ঘটে গেল এক কালজয়ী ঘটনা। সলিল চৌধুরী কিছু গান নিয়ে গেলেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে, উদ্দেশ্য তিনি যদি তাঁর গান শুনে রেকর্ডে গান করতে রাজী হন। সলিল চৌধুরী তাঁর বহু গান শোনালেন কিন্তু হেমন্ত বাবুর কোন গান পছন্দ হল না। শেষে ফিরে আসার সময় তাঁর মনে হয় একটা গানের আধখানা সেটা শোনালে কেমন হয়। শোনালেন, শুনেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বললেন 'গানটা শেষ কর'। গানটা চিরাচরিত প্রেমের নয়, এক গাঁয়ের বধূর আশা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। পরে সে গান শুনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই নবাগত সুরকারের গান গাইলেন গ্রামোফোন রেকর্ডের দুপিঠ জুড়ে। গানটি 'গাঁয়ের বধূ'। ইতিহাস সৃষ্টি করলো সে গান, তারপর ধীরে ধীরে সলিল চৌধুরী হয়ে উঠলেন ভারতীয় সংগীতের এক মহান স্রষ্টা।

ঠিক এ সময়ে তাঁর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে গণনাট্যের দলীয় কর্তাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেন, আমরা তাঁরই কথা তুলে ধরি ঃ 'চল্লিশ দশকের একেবারে শেষের দিকে কথা। আমি বুঝতে পারছিলাম চূড়ান্ত বাম-বিচ্যুতির মধ্যে শিল্পী হিসাবে দম আটকে মরা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। 'গাঁয়ের বধূ' গানকে গণনাট্যের আসরে নিষিদ্ধ করা হল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান' প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষণা করা হল। আর একটি গান যেটি আমাদের তখন ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে ঝড় তুলেছিল, সেটি হল সন্ধ্যা মুখার্জীর গাওয়া এইচ.এম.ভি. রেকর্ডে আমার গান, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে'। সংস্কৃতি নেতারা ঘোষণা করলেন এটি একটি প্রতিবিপ্লবী চিন্তাধারার ফসল। এটা গণ নাট্যে গাওয়া যাবে না বরং এ ধরনের গীত রচনার জন্য একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।' গানটির কিছুটা তুলে ধরলে বোঝা যায় :

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আয় রিমঝিম বরষার গগণে
কাটাফাটা রোদের আগুনে
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।
হায় বিধি বড় দারুন
পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না
হায় বিধি বড়ই দারুন
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে আহার মেলে না
কি দিব তোমারে নাই যেন ধান খামারে
মোর কপাল গুনে
কাঠফাটা রোদের আগুনে' ইত্যাদি ইত্যাদি

এখানে কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের আপত্তি 'হায় বিধি' কে নিয়ে। তারা মনে করে এ হাল হায় ভগবান কিংবা হায় আল্লা। যা গণনাট্য কর্মীর উচ্চারণ করা উচিত নয়। কিন্তু এই হায় বিধি যে বাংলায় উচ্ছ্বাসের প্রয়োগ তা তাদের বোঝানো অসম্ভব। অথচ 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' গানটি গণনাট্য মঞ্চে সচল। ওদের যুক্তি এটি প্রচলিত গান। কাজেই বাধা নেই। আবার ১৯৫৯ সালে যখন সলিল চৌধুরী 'সাত ভাই চম্পা' গানটি লতা মঙ্গেশকরের গলায় রেকর্ড করেছিলেন এইচ.এম.ভি. থেকে তাতে ওই গানের ভেতর

'ঘরে ক্ষিদের জ্বালা
আছে যৌবন জ্বালা
রাজার কুমার আর আসে না ঘোড়ায় চড়ে'।

'আছে যৌবন জ্বালা' এই কথাটিতে কিছু বামপন্থী সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের গা রী রী করেছিল সলিল বাবুর 'অধঃপতনের' কারণ। এসব কারণে ক্ষোভে অভিমানে এক বামপন্থী সম্মেলনে কর্মীরা তাকে যেতে অনুরোধ করলে তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর জবাব ছিল - 'ওখানে অশিল্পীদের প্রাধান্য। প্রকৃত শিল্পীদের স্বাধীনতা হরণ করে।'

।। ২।।

১৯৪৩ সালে তাঁর সাংস্কৃতিক জীবন শুরু হলেও ১৯৪৯ সালে শিল্পী জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে তিনি চলচ্চিত্রে গীতিকার ও সুরকার হিসাবে কাজ শুরু করেন 'পরিবর্তন' ছবির জন্য। এরপরে ১৯৫১ সালে 'বরযাত্রী', ১৯৫২ তে 'পাশের বাড়ি' এবং তারপর ১৯৫৬ তে তিনি বম্বে গিয়ে 'দু-বিঘা জমিন' তে সুরারোপ করেন। ওই ফিল্মে মান্না দের গান 'ধরতি কহে পুকার কে' তাঁকে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠা দেয়। এরপর ১৯৯৫ পর্যন্ত তিনি হিন্দি, দক্ষিণ ভারত ও বাংলাদেশের বহু ছবিতে সুরারোপ করেন। পাশাপাশি বাংলায় রায় বাহাদুর, লাল পাথর, একদিন রাত্রে, কবিতা, সিস্টার, মর্জিনা আবদুল্লা-র গান কালজয়ী হয়ে আছে। ১৯৮৯ সালে গাঁধের বধূর পরে এইচ. এম. ভি. তে ও অন্যান্য কোম্পানীর কথা তাঁর কথা ও সুরে শারদীয়া সংগীত গুলিও ভোলার নয় যেমন ১৯৫০-এ অবাক পৃথিবী, সেই মেয়ে, ১৯৫২ তে 'শ্যামলবরণী ওগো কন্যা।', 'নাও গান ভরে', 'প্রান্তরের গান আমার', 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা', ১৯৫৪ -এ 'ধিতাং ধিতাং বোলে।' ১৯৬৯-এ 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা', 'শোন কোন একদিন', ১৯৭২ -এ 'অন্তবিহীন কাটে না আর' ১৯৮০ তে 'পথে এবার নামো সাথী' ইত্যাদি স্বর্ণ যুগের অম্লান সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

সলিল চৌধুরীর সুর প্রধানত কোন ধারায় না চলার কারণ প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের সংগীত তিনি গভীরভাবে জেনেছেন ও বুঝেছেন বলে। কার্যত তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত থেকেছেন প্রথম থেকেই। পাশাপাশি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের থেকে শুরু হওয়ার কারণে তাঁর সুরের ও কথার মধ্যে গোঁড়ামি প্রাধান্য পায়নি। তিনি তাঁর এক প্রবন্ধ 'সুর সৃষ্টি সম্পর্কে' তে জানান : 'একটি কথা মনে হাখতে হবে যে সংগীত জীবন্ত ও জীবন্ত বলেই পরিবর্তনশীল। মানুষের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন শব্দ (sound), নতুন ভাবধারা, নতুন জীবন যাত্রার প্রভাব সংগীতে পড়বেই। যারা কোন সংগীতের , 'অব্যয়' তার বিশ্বাস করেন তারা ভুল করেন এবং সংরক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করেন।' তিনি গোড়াতেই কটাক্ষ করে এ প্রবন্ধে বলেন: 'যে কোন গোঁড়ামি আমাদের ক্ষতিই করছে এইটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' ফলে তিনি ইমন রাগ ভেঙে 'আজ তবে এইটুকু থাক' গানটি সৃষ্টি করেছেন, 'ভালোবাসি বলে ভালবাসি বলি না' হৈমন্তী শুক্লাকে দিয়ে তাঁর গাওয়ানো এই রাগাশ্রয়ী গানটিতে তিনি যে কৌশলে বেহাগকে ভেঙেছেন তার ফলে এটি তাঁর অন্যতম অনন্য কীর্তি হয়ে আছে।

কয়্যার বা বৃন্দগানে সলিল চৌধুরী এক বিস্ময়। তাঁর মত সমস্ত গানটিকে হারমনাইজ করা বহু সুরকারের পক্ষে কষ্টসাধ্য। অথচ কত সহজে তিনি তা করতে পারতেন। হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী স্বরলিপিতে তাঁর দখল ছিল ঈর্ষনীয়। পঞ্চাশের দশকে তিনি 'বম্বে ইয়ুথ কয়্যার প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে ছিলেন লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, মুকেশ, নৌশাদ, প্রেম ধাওয়াল, অনিল বিশ্বাস, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ। সত্তরের দশকে এইচ.এম.ভি. থেকে প্রকাশিত সলিল চৌধুরীর কিছু গণসংগীত কয়্যারের মাধ্যমে একটি লং প্লেয়িং রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। তা শুনলে বোঝা যায় কত অসাধারণ ভাবে তিনি কয়্যার পরিচালনা করেছেন

।। ৩।।

শুধুমাত্র সলিল চৌধুরীর সুর বা সংগীত পরিচালনা নয় তাঁর গীতিকার হিসেবে যে ভূমিকা ছিল তার এক বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তাঁর গানের জীবনের প্রথমাংশের গানের কথায় এক অন্যরকম সাধাসিধে ভাব সুরের মিশেলে মানুষকে দোলা দিত। পরবর্তীকালে তিনি যখন পেশাগত হিসেবে সংগীতে আসেন তখন ধীরে ধীরে তা থেকে সরিয়ে গীতিকাব্যের জায়গায় তাঁর গান দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। তাঁকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, বহু গানে তিনি সঞ্চারী আনেন নি। কিন্তু তাতে সে গানের কোন অঙ্গহানি ঘটেনি। যেহেতু বর্তমান প্রাবন্ধিক গান রচনা ও সুর দেওয়ার কিছু কিছু চেষ্টা চরিত্র করে থাকে তাই তার জানা আছে একজন স্রষ্টার একযোগে গীতিকার ও সুরকার হওয়ার সুবিধেগুলি। সলিল চৌধুরী সেই সুবিধাগুলি উপভোগ করেছেন ও নিজের মতো করে কথাগুলি সাজিয়ে নিতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। ফলে অবলীলায় 'তমসী তমস্বিনী রাত্রি' কিংবা 'সংক্রান্তির লগ্ন এবার'-এর মতো যুক্তাক্ষর লাগিয়ে অসাধারণ সংগীত গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু তবুও অনেকাংশে তাঁর সুর থেকে কথাকে নিষ্প্রভ মনের হয়েছে কারণ বহু গানে এই শব্দ লাগানোর চেষ্টা (সজনী, অন্তবিহীন ইত্যাদি) আবার বহু গানে পাই ঝিলিক ঝিলিক, রুম ঝুম, গুন গুন, ঝর ঝর ইত্যাদি শব্দ, ফলে বহু ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অনেক সময় শুনতে অস্বস্তি হয়। এ সত্ত্বেও আমরা পাই তাঁর গানে কাব্যিক তৃপ্তি ঃ

'এদিন তো যাবে না
মানা তুমি যতই কর
যা ইচ্ছা বলনা
রবে তুমি শর্ত কর।'

আবার ব্যঙ্গাত্মক গানে পাই বৌদ্ধিক আমেজ। 'একদিন রাত্রে' ছবিতে ছবি বিশ্বাসের লিপে মান্না দে-র অনবদ্য গানটির

দ্বিতীয় অংশে :

‘এই বুক থেকে কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে
রাখি এই মানিব্যাগেতে
আর মানিব্যাগ থেকে টাকাগুলি
নিয়ে যদি রাখি পাঁজরার ফাঁকেতে,
এই টাকাটা তো চলবেই
ধক ধর ধক ধক চলবেই
শুধু কলজেটা যাও যদি ভাঙাতে
কিছু মিলবে না একরত্তি।’

সলিল চৌধুরীর ছড়ার গানগুলিও (অন্তরা চৌধুরী কণ্ঠে) অসাধারণ। ‘ও মাগো মা অন্য কিছু গল্প বল’ -র মতো সামাজিক সচেতন ছড়ায় যেভাবে তিনি সুরে সাজিয়েছেন তাতে বিস্ময় জাগে।

১৯২২ থেকে ১৯৯৫ এই ৭৩ বছরের জীবনে তিনি কার্যত সংগীতের এক বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা করে গেছেন। আধুনিকতা কি হওয়া উচিত তা তিনি তাঁর সমালোচকদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়েছেন। ‘সুরসৃষ্টি সম্পর্কে’ প্রবন্ধে তিনি আরো জানিয়েছেন, ‘আধুনিক সংগীত’ বললেই যারা নাক সিটকোন তাঁদের জানা উচিত সংগীতের আধুনিকতা বাস্তবতার সৃষ্টি এবং প্রাচীন সংগীতকে তাঁরা সংগীতের স্থান দেন সেটাও প্রাচীন যুগের ‘আধুনিক সংগীত’ বলে’।

তথ্য

১। সেই বাঁশিওয়ালা, একটি সলিল সংকলন। সংকলনও সম্পাদক-বাবলু দাশগুপ্ত

২। ত্বষ্টা, বিষয় বাংলা গান। সম্পাদক - তাপস রায়। এই সংকলেনর প্রবুদ্ধ বাগচী-র বাংলা গণসংগীত ঃ প্রত্যাখ্যানের পটভূমি প্রবন্ধ থেকে।

৩। চেতনার গান, গণসংগীত ও প্রাথমিক ভাবনা। বইটির মধ্যে সলিল চৌধুরীর লেখা ‘সুরসৃষ্টি সম্পর্কে’ প্রবন্ধ।

৪। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৩ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে পুস্তক পরিচয় বিভাগে ‘সলিল চৌধুরী : দ্য নন-কনফর্মিস্ট জিনিয়াস’ গ্রন্থের স্বপন সোম কৃত আলোচনা।